INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 7.560 (SJIF 2024)

লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের আলোকে রাজস্থানের লোক দেবতা : একটি পর্য ালোচনা

(Folk Deities of Rajasthan in the Light of Folk Cultural Tradition: A Study)

অরুপ কুমার রায়*[1]

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/12.2024-74692841/IRJHIS2412012

Abstract:

Folk traditions and culture hold a central position in Indian society, where folk deities are accorded great significance. These deities are viewed as protectors who maintain social, psychological, and cultural balance, addressing communal issues and ensuring peace and contentment for their followers. The belief in these deities fosters a sense of spiritual unity and shared cultural heritage among communities. Core elements such as religion, tradition, spirituality, faith, and collective reverence are essential pillars supporting Indian social and cultural frameworks. The worship of folk deities, rooted in strong faith, has significantly contributed to the growth of minor cultural identities within the broader Indian cultural context. These deities, deeply connected to the traditions of rural communities, represent the foundation of grassroots cultural practices. In Rajasthan, many such deities, believed to have once lived as humans, gained widespread respect and devotion through their acts of altruism and public welfare. Over time, this admiration transformed them into divine figures in the collective memory of the people. These deities have become legendary heroes, serving as focal points for the evolution of folklore, cultural traditions, and folk music. Today, deities such as Ramdevji, Devnarayanji, Pabhuji, Gogaji, Tejaji, and Harbhuji continue to be revered, playing a vital role in shaping the spiritual and cultural identity of Rajasthan.

Keywords: *Folk tradition, folk deities, cultural heritage, rural communities, folklore, minor culture, broader culture, Rajasthan*

*স্নাতকোত্তর, ইতিহাসবিভাগ, কল্যাণীবিশ্ববিদ্যালয়, সেট।
E-mail: arupkumarr27@gmail.com

ভূমিকা:

যে কোনও রাজ্যের লোকজীবনে লোকদেবতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটি বলা যায় যে জীবনের এমন কোনও শুভ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নেই যেখানে তাদের পবিত্র নৈবেদ্য এবং শুভ আশীর্ব াদগ্রহণ করতে হয় না। সভ্যতা-সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ অনেকটাই অর্জিত হয়েছে এই শত প্রকারের দেব-দেবীদের দ্বারা। রাজস্থানের এমন কোনো গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে এই দেব-দেবীর জন্য কোনো স্থান, মঞ্চ, উপাসনালয়,বা মন্দির নেই। লোকদেবতা দের 'মূর্তি' বাড়িতে রাখা হয় এবং তাদের তিথিতে ধূপকাঠি নিবেদন করে পূজা করা হয়। লোকদেবতাকে সাদা কাপড়ে এবং দেবীদেরকে রাখা হয় লাল কাপড়ে যাকে বলা হয় 'ওছাদ'। অনেকে তাদের পারিবারিক উপাস্য লোক দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করে শিশু ও কিশোর কিশোরী দের গলায় পরিয়ে দেয়।

রাজস্থানের বিভিন্ন স্থান লোক দেবতাদের নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে যেমন তাঁদের জন্মস্থান, দেহত্যাগের স্থান বা কোন অলৌকিক অসাধ্য সাধন করেছেন এমন স্থান তাঁদের নামের সঙ্গে বিখ্যাত হয়ে আছে। এর মধ্যে কয়েকটি এত বিখ্যাত যে প্রতি সপ্তাহে প্রচুর লোক সমাগম হয়। অনেক জায়গায় বছরে একবার বা দুবার বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়। অনেক জায়গায় রাতের মিছিলও হয়। দৈহিক, মানসিক ও অন্যান্য প্রকারের যন্ত্রণায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের কাছে আসেন এবং তাঁর নাম জপে তাদের রোগ থেকে মুক্তি পান। পাবুজী উটের সকল প্রকার রোগ নিরাময় করেন। তেজাজি, সাপে কামড়ানো ব্যক্তির কার্য করচিকিৎসা প্রদান করেন। কুকুরে কামড়ানো ব্যক্তি লোক দেবতার 'মেড়ীতে' গিয়ে আরোগ্য লাভ করে। অনেক অন্ধ ও প্রতিবন্ধীকে আভারী মাতার শরণাপন্ন হয়ে সম্পূর্ণ প্রার্থ নাকরেন।

গবেষণার পৃষ্ঠভূমি :

মধ্যযুগে যখন সমগ্র রাজস্থানে বিদেশী হানাদারদের আতঙ্ক বাড়ছিল, তখন এখানে প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তিক্ততার ফলে ব্যবধান বেড়ছিল ।এমন কঠিন পরিস্থিতিতে, রাজস্থানে জন্মগ্রহণ করেন কয়েক জন সাহসী মানুষ যারা সমাজে তাঁদের জীবদ্দশায় কেবল জনগণ এবং অন্তর্দ্ব ন্দ্বীশাসকদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেননি বরং অস্পৃশ্য ও নিম্নবিত্তদের সম্পূর্ণ সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা সমাজের অবহেলিত শ্রেণীকে সাহায্য করেছেন যারা সর্ব দাউচ্চশ্রেণির দ্বারা নির্য াতিতছিল এবং মৃত্যুর আগ পর্য ন্ততাদের সমর্থ নকরেছেন। সমাজের শ্রেণীবৈষম্যের অনুভূতিকে সম্পূর্ণ রূপেধ্বংস করার জন্য তাঁরা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের সর্ব স্বউৎসর্গ কারী নায়কদের গণমানসে লোকনায়কের মতো উচ্চ মর্য াদাদেওয়া হয়েছে। 'বচন বাপ মারদান কা কাহিজাই জুগ মে এক',

কথায় ও কাজে এত ঘনিষ্ঠতা এবং তাও বীরত্বপূর্ণ মর্মে ভরা। নায়কদের এমন আদর্শ জীবন কাহিনী মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। পশ্চিম রাজস্থানরে এই ভূমি, যেখানে প্রতিটি অংশ বীরদের রক্তে রঞ্জিত। বীরদের আত্মত্যাগ ও সেই আত্মত্যাগকে স্মরণ করার জন্য এই অঞ্চলে একটি অনন্য সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল এখানে, 'ভোমিয়া জি' এবং 'জুঞ্জার জি'-কে পূজা করার ঐতিহ্য চিরন্তন। প্রতিটি গ্রামে 'দেবল', 'থান' ও 'চবুতরে' মানুষের বিশ্বাসের কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান। এই নায়করা তাদের দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। আজও তাদের সামনে আমাদের মাথা নত হয়। এমন নায়কদের মধ্যে পাবুজি রাঠোরের, রামদেবজি, গোগাজি, হাড়বুজি, মোহাজির স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।

রাজস্থানের লোক দেবতারা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কিত সাহিত্যে রাজপুত সংস্কৃতির সম্পূর্ণ চিত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের সামনে উঠে আসে। এমন সাহসী যোদ্ধাদের আত্মত্যাগের জোরেই পাঁচশত বছর রাজপুতদের 'রাজপুতি' ম্লান হয়নি। একদিকে পাবুজি ও গোগাজীর আত্মত্যাগ তাঁদেরকে রাজনৈতিক মহলে একজন অতুলনীয় যোদ্ধা ও শাসক হিসেবে সম্মানিত ও আদর্শে পরিণত করেছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ হয়ে তাঁরা হয়ে উঠেছেন জনমনে একজন লোকনায়ক। সনাতন ধর্মে রঅন্যতম উপাদান 'গরু' রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে লোক দেবতারা সনাতন ধর্ম াবলম্বীদেরউপাসক হয়েছিলেন এবং এর সাথে সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে বাকসিদ্ধ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

রাজস্থানের লোক দেবতারা মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছেন, মাতৃভূমিকে ভালোবেসেছেন, অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্ত করেছেনসমাজকে এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ অনুসরণ করেছেন, ফলস্বরূপ, লোক দেবতা দের 'থান' তৈরি হয়েছে দুর্গ ও দুর্গে, পথের পাশে, পাহাড়ের চূড়ায় এবং গ্রামের মধ্যে যেখানে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং 'ঘানি' আরতি করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য :

১. রাজস্থানে বিভিন্ন লোক দেবতা ও তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যের অনুসন্ধান।

২. রাজস্থানের লোকসংস্কৃতিতে লোকদেবতাদের গুরুত্ব নির্ধ ারণ।

৩. লোক দেবতা দের প্রতি আস্থা ও বীর পূজার সম্পর্ক নির্ধ ারণ।

রাজস্থানের বিভিন্ন লোকদেবতাগণ:

পাবু,হাড়বু,রামদেব, মঙ্গলিয়া মেহা।

পাঞ্চুপীরপধারজ্যো, গোগাজীজেহা।।

উক্ত প্রবাদটি রাজস্থানে বহুল প্রচলিত একটি কথা। এর মাধ্যমে রাজস্থানের লোকসমাজে প্রচলিত লোক-দেবতাদের স্মরণ করা হয়।।

গোগাজি

চৌহান বীর গোগাজি946 খ্রিস্টাব্দ চুরু জেলার দদেরবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম জেওয়ারসিংহ এবং মায়ের নাম বাছল দেবী। লোককথা অনুসারে গুরু গোরখনাথের আশীর্ব াদে গোগাজির জন্ম হয়েছিল।

কোলুমান্দার রাজকন্যা কেলমাডের সাথে তার বিবাহ ঠিক হয়েছিল, কিন্তু বিয়ে হওয়ার আগেই কেলমাডকে একটি সাপে কামড়েছিল।লোক কথানুসারেএতে গোগাজি রাগান্বিত হয়ে মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। মন্ত্রের শক্তিতে তেলের কড়াইতে পড়ে সাপগুলো মারা যেতে থাকে। তারপর সর্প দেবতা তক্ষক স্বয়ং আবির্ভূত হলেন এবং কেলমাদের বিষ বের করেন এবং গোগাজিকে সাপের দেবতা হওয়ার আশীর্ব াদকরলেন। আজও সাপের কামড় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গোগাজির পূজা করা হয়। লোকবিশ্বাস অনুসারে যে সাপে কামড়ানো ব্যক্তিকে যদি গোগাজির মেড়ীতে (গোগাজির পূজাস্থান) আনা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি সাপের বিষ থেকে মুক্ত হন। ভাদ্রপদ কৃষ্ণ নবমীতে গোগাজীর স্মরণে মেলার আয়োজন করা হয়। গোগাজিকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করা হয়। গোগাজি সাপের ঈশ্বর, জহরপীর, নাগরাজের অবতার, গোগাপীর এবং মুসলিম ধর্মে জীবিত পীর ইত্যাদি নামে পরিচিত। কবি মেহ "গোগাজি কা রসওয়ালা" শিরোনামের বইতে গোগাজি এবং মাহমুদ গজনভির মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্ণ নাকরেছেন এবং জানকবি ও "কায়মরাসো" নামক গ্রন্থে গোগাজি এবং মাহমুদ গজনভির মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্ণ নাকরেছেন। গজনবীই গোগাজিকে হত্যা করেছিলেন।

গোগাজির ভক্তরা সঙ্কল নৃত্য পরিবেশন করে। রাজস্থানে কৃষকরা বর্ষ াঋতুর পর জমি চাষ করার পূর্বে গোগাজীর নামাঙ্কিত পবিত্র সুতো লাঙ্গলে বেঁধে দেন। গোগাজির 'থান' খেজাদি গাছের নীচে, যেখানে একটি সাপের আকৃতিকে একটি মূর্তি আকারে পাথরের উপর খোদাই করে পূজা করা হয়। গোগাজির জন্মস্থান দাদরেবা গ্রামে 'শীর্ষ মেড়ী' এবং তাঁর সমাধিস্থল 'গোগা মেডি' (নোহর-হনুমানগড়) অবস্থিত এই স্থানটিকে 'ধুরমেদি'ও বলা হয়।

পাবুজি

মোডজি আশিয়া এবং লোক সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, পাবুজি বর্তমান বাড়মের থেকে আট মাইল দূরে 'খাড়ি খাবড়ের জুনা' নামক গ্রামে এক অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পাবুজির বিয়ে হয়েছিল অমরকোটের সুরজমল সোধার কন্যা সোধির সাথে। বিয়ের মাঝখানে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভগ্নিপতি জয়াল (নাগৌর) নরেশ জিন্দারাও খিঞ্চী দেবল চরণীর গরু ঘেরাও করে। দেবল পাবুজিকে অনুরোধ করলেন গরু মুক্ত করার জন্যবিবাহের তিন পাক পূর্ণ করার পর, চতুর্থ পাক পূর্ণ করার আগেই তিনি গরু রক্ষায় দেবল চরনীর কেশর কলমি ঘোড়ায় চড়ে রওনা হন। এক কঠিন সংগ্রামে ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে পাবুজি বহু সঙ্গীসহ বীর গতি বরণ করেন। তার সাহসিকতা, প্রতিশ্রুতি পালন, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও গরু রক্ষায় ত্যাগের কারণে মানুষ তাকে লোকদেবতা

হিসেবে পূজা করে। তাদের প্রধান উপাসনালয় কোলু (ফালোদি)। যেখানে প্রতি বছর তার স্মরণে মেলার আয়োজন করা হয়। তাদের প্রতীকটি তার হাতে একটি বর্শা নিয়ে ঘোড়ার সওয়ারের আকারে জনপ্রিয়। পাবুজিকে উটের দেবতা হিসেবে পূজা করা হয়। মাড়োয়ারে প্রথমবার উট আনার কৃতিত্ব পাবুজির। উট সুস্থ হলে পাবুজির গান ভোপে ভোপীরা গায়। গ্রাম্য মানুষ তাকে লক্ষ্মণজীর অবতার বলে মনে করে। পাবুজি হলেন রাজস্থানের উটপালক রাইকা বা রেবারী সম্প্রদায়ের ও থোরী সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা। কোলুমন্ড নামক স্থানে এই লোকদেবতার প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানঅবস্থিত যেখানে প্রতিবছর চৈত্র অমাবস্যায় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।, যেখানে তার ভক্তরা বিশেষ ভঙ্গিমায় নিত্য পরিবেশনা করেন যে নৃত্যকে 'থালি' নৃত্য বলা হয়। পাবুজির নিয়ে একাধিক সাহিত্য ও রচিত হয়েছে। মোহাজী আশিয়া 'পাবু প্রকাশ' নামক গ্রন্থে পাবুজির জীবনী লিখেছেন। একই রকম ভাবে মোহাজি বিঠু 'পাবুজী রা ছন্দ' ও লাঘবরাজজী 'বাবুজি রা দোহা' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। পাবুজীর সঙ্গে সম্পর্কিত গান 'পাবুজী কে পবাড়ে' নামে প্রসিদ্ধ যা রেবারী সম্প্রদায়ের মানুষেরা 'মাঠ' নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান। একই রকম ভাবে ' পাবুজী কি ফড়' নায়ক সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভোপোগন 'রাবনহত্থা' বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গেয়ে বেড়ায়।

রামদেবজী

তানওয়ার রাজবংশের আজমলজি ও ময়নাদের পুত্র রামদেবজি বাড়মের জেলার শিব তহসিলের উন্দুকাসমের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে মল্লিনাথজির সমসাময়িক মনে করা হয়। শৈশবেই, মল্লিনাথজির কাছ থেকে পোকারান এলাকা অধিগ্রহণ করার পর, তিনি ভৈরব নামে এক নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে (তান্ত্রিক) হত্যা করে সেখানে অরাজকতা ও সন্ত্রাসের অবসান ঘটান। তিনি অমরকোটের দলজি সোধার কন্যা নেতালদেকে বিয়ে করেছিলেন। পোকরানকে তার ভাইঝিকে যৌতুক হিসেবে দেওয়ার পর, তিনি 'রামদেবরা' (রুনেচা) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দের ভাদ্রপদ শুক্লা একাদশীতে সেখানে জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন। ভাদ্রপদ শুক্লা দ্বিতীয়ায় এখানে বিশাল মেলা বসে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই মেলাতেই হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরাই অংশগ্রহণ করেন।। এই মেলার অন্যতম একটি দিক হলো রামদেবের ভক্তিতে কামাড় জাতির মহিলাদের করা তেরহতালী নৃত্য। লোক কথা অনুসারে কামাড় সম্পাদায়ের প্রতিষ্ঠা রামদেবজিই করেছিলেন, ঠিক যেমনটা জাম্ভোজী করেছিলেন বিষ্নোই সম্প্রদায়ের। রামদেজীর সম্পাদিত অলৌকিক কাজকে লোককথা অনুসারে 'পর্চা' বলা হয় এবং সেই লোক কথাকে যখন সুর করে গাওয়া হয় তখন তাকে 'ব্যাবলে' বলা হয়। রামদেবজীর মন্দির ' দেবরা' নামে পরিচিত,যার উপর সাদা অথবা পাঁচ বর্ণে রপতাকা টানানো হয় যা ' নেজা' নামে প্রসিদ্ধ। রামদেবজী নিজে একজন কবি ও ছিলেন, তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'চব্বিশ বাণী'।

মেহাজী মঙ্গলিয়া

রাজস্থানের পাঁচপীরদের মধ্যে মেহাজি মঙ্গলিয়া অন্যতম । তিনি রাও চুন্দার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি পানওয়ার ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তার প্রতিপালন মঙ্গলিয়া গোত্রধারী মাতুল পরিবারে হয়। তাই তিনি মেহাজী মঙ্গলিয়া নামে প্রসিদ্ধ হন। আত্মমর্য াদাশীলস্বভাবের কারণে তার অনেক শত্রু ছিল। শেষ পর্য ন্তজয়সলমীরের রাও রানাগদেব ভাটির সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে বীর গতি প্রাপ্ত করেন । তিনি একজন ভালো জ্যোতিষী ছিলেন। মানুষের সেবা, সাহায্য ও সুরক্ষার কারণে তিনি লোকদেবতা হিসেবে পূজিত হন। বাপানীতে তার মন্দির আছে, যেখানে ভাদ্রপদ কৃষ্ণ অষ্টমীতে মেলার আয়োজন করা হয়। তিনি ' কিরড় কাবরা' নামক ঘোড়ায় চড়ে গরুদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করেন। কবি জসদান বিঠু তার 'বীর মেহা প্রকাশ ' নামক গ্রন্থে মেহাজির বীরগাথার বর্ণ নাকরেছেন।

দেবনারায়ণজী

দেবনারায়নজীর জন্ম ১২৪৩ সালে ভীলওয়াড়া জেলার আসিন্দা গ্রামে হয়। তিনি বগড়াবত কুলের নাগবংশীয় গূর্জর সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন। গূর্জর সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাকে 'বিষ্ণুর অবতার' বলে মনে করেন। দেবনারায়নজী আয়ুর্বে দশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন, তাই তার ভক্তরা নিম গাছের নিচে একটি ইট স্থাপন করে সেই ইটকে দেবনারায়ণের প্রতীক মনে করে নিম পাতা উৎসর্গ করে পূজা করে থাকেন। দেব নারায়ণ জি তার প্রিয় ঘোড়া 'লীলাগর' এ চড়ে যুদ্ধ করতেন, তার বীর গাঁথা গূর্জর সম্প্রদায়ের লোকেরা 'জন্তর' নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে শোনান। দেবনারায়ণজির প্রধান তীর্থ স্থানহল ভিলওয়ারা জেলার আসিন্দা, যেখানে প্রতিবছর ভাদ্র মাসের শুক্লা পক্ষের সপ্তমী তিথিতে বড় মেলার আয়োজন হয়। অন্যান্য তীর্থ স্থানহল আজমির জেলার দেব মালি, টোঙ্ক জেলার জোধপুরিয়া এবং চিতোরগড় জেলার দেবডুংরি পাহাড়। রাজস্থানের সমস্ত লোক দেবতাদের মধ্যে দেবনারায়ণ জির ফার সবথেকে বেশি বৃহৎ এবং জনপ্রিয়। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার দেবনারায়ণজীর ফড়ের উপর একটি ডাক টিকিট প্রকাশ করে এবং পরবর্তী সময়ে ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় সঞ্চার মন্ত্রণালয় দেবনারায়ণজির উপর আরেকটি ডাক টিকিট প্রকাশ করে।

বীর তেজাজী

তেজাজীর জন্ম ১০৭৩ সালে নাগোর জেলার খাড়নাল গ্রামে এক জাট পরিবারে হয়। লোক কথা অনুসারে তেজাজি একজন বীরপুরুষ ছিলেন এবং অন্যায়ের বিপদে সাহায্যের জন্য সর্ব দা প্রস্তুত থাকতেন, তিনি যখন তার পত্নী পেমালদে কে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরালয় যাচ্ছিলেন তখন মের লুণ্ঠনকারীরা লাচ্ছা গুজারি নামক এক মহিলার গরুর পাল লুট করে পালাচ্ছিল। লাচ্ছা গুজারির প্রার্থ নায়তেজাজি মের লুণ্ঠনকারীদের বাধা দেন এবং গরু সফল হন, সেই থেকে রাজস্থানের লোকসমাজে তেজাজি গোরক্ষক দেবতা রূপে পূজিত হন। সাপ এবং কুকুরের কামড়ানো ব্যক্তি ও

তেজাজির পূজা করে আরোগ্য প্রার্থ নাকরেন। রাজস্থানের কৃষকেরা তেজাজির গান গেয়ে জমিতে ফসল বুনতে আরম্ভ করেন। যে সকল চারণ সম্প্রদায় তেজাজির গান গ্রামে গ্রামে গিয়ে বেড়ান তাদেরকে 'ঘোড়লা' বলা হয়। তেজাজীর সবথেকে প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানহল নাগোর জেলার পরবতসর। উক্ত স্থানে প্রতিবছর ভাদ্র মাসের শুক্লাপক্ষের দশমী তিথিতে (তেজা দশমী) বড় মেলার আয়োজন করা হয়। তেজাজির অন্যান্য তীর্থ স্থানগুলো হল আজমির জেলার সুরসুরা ও সৌন্দরিয়া এবং নাটোর জেলার খড়নাল। রাজস্থানের সহরিয়া উপজাতির আরাধ্য দেবতা হলেন এই তেজাজি। তেঁজাজির সঙ্গে সম্পর্কিত লোককথার মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হলো দুর্ব লকেরক্ষা করা এবং নিজের দেওয়া কথাকে পালন করা।

হারভুজি

হরভুজি ছিলেন ভুন্ডেলের (নাগৌর) মহারাজা শঙ্খলার পুত্র এবং রাও যোধা (1438-89 খ্রি.) এর সমসাময়িক। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ভুন্ডেল ছেড়ে হরভমজাল নামক স্থানে এসে বসবাস শুরু করেন। এখানে রামদেবজীর অনুপ্রেরণায় তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেন এবং তাঁর গুরু বালিনাথজীর কাছে দীক্ষা নেন। লোককথা অনুসারে মেবাড়ের শাসন থেকে মান্ডোরকে মুক্ত করার প্রচেষ্টার সময় তিনি রাও যোধাকে আশীর্ব াদ্সহ একটি খঞ্জর দিয়েছিলেন। এই সাহায্য ও আশীর্ব াদ্বোও যোধা সফল হন এবং যোধা হারভুজি কে 'বেংটি' গ্রাম দেন। হরভুজিকে একজন মহান জ্যোতিষী বচনসিদ্ধ এবং একজন অলৌকিক মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হত। হারভুজীর প্রধান তীর্থ স্থান বেংতীতে (ফালোদি) অবস্থিত। মনো ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার পর ভক্তরা এখানে তাঁর মন্দিরে স্থাপিত 'হরভুজি কি গাদি' তে পূজা করেন।

লোকদেবতা ও লোকবিশ্বাস-

লোকদেবতারা তাদের জীবদ্দশায় জনকল্যাণমূলক কাজ এবং সমাজসেবার কারণে সমাজে সম্মানের যোগ্য হয়ে ওঠেন। তিনারা বেঁচে থাকতেই আশেপাশের মানুষ তাদেরকে একজন মহান মানুষ হিসেবে সম্মান করতে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে, শ্রদ্ধা ও সম্মানের এই অনুভূতিটি বিশ্বাসের আকারে প্রকাশ পায় । এই বিশ্বাস লোকদেবতার প্রতি লোকবিশ্বাসে পরিণত হয়।

রাজস্থানের লোক জীবনে লোক দেবতাদের প্রভাব :

রাজস্থানের লোক জীবনে লোকো দেবতাদের স্থান সর্ব স্তরেলক্ষণীয়। সাধারণ মানুষ তাদের শুভ কাজ শুরু করার পূর্বে প্রতি গ্রামে লোকদেবতাদের থানে গিয়ে আশীর্ব াদ্বা কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার প্রার্থ নাকরেন। প্রতিটি গ্রামেই খেজড়ী গাছের (পশ্চিম রাজস্থানের স্থানীয় বৃক্ষ) নিচে বা পাহাড়ের চূড়ায় এবং রাস্তার পাশে স্থাপিত মেরি দেখতে পাওয়া যায়। লোগো দেবতাদের কেন্দ্র করে দেবতার নামের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা স্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। লোকো দেবতাদের মাহাত্ম্য ফটো চিত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হয় যাকে ফাড় বলা হয়।। লোগো দেবতাদের কেন্দ্র করে রাজস্থানের

লোকসংগীত এবং লোকসাহিত্যেরও বিকাশ ঘটেছে। লোকদেবতা কেন্দ্রিক সংগীতকে ভোপান নামক গায়কেরা নানা স্থানে ঘুরে দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। সাধারণ মানুষেরা শিশুর নামকরণ গৃহ নির্ম াণও শুভ কাজ সম্পাদনের পূর্বে লোকদেভতাদের কাছে মান্নত বা আশীর্ব াদপ্রার্থ নাকরেন।। কৃষক ও পশুপালক রাইকা সম্প্রদায়ের মানুষেরা পশুধন উন্নতির জন্য লোকদেবতা হার্ব জিরক্কাছে প্রার্থ নাকরেন।

ফড়:

ফাড় হল রাজস্থানের একটি বিখ্যাত লোক চিত্র শৈলী। যা বাংলার পটচিত্রের সমার্থ ক৷ একটি দীর্ঘ কাপড়ের উপর বিভিন্ন লোক দেবতার মাহাত্ম্য ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়।। লোক দেবতার জীবনী ও মাহাত্ম্য অঙ্কিত এই রঙিন দীর্ঘ কাপড়কেই ফাড় বলা হয়।। বিভিন্ন লোক দেবতার ফাড় সেই লোকদেবতার নামেই পরিচিত হয়। যেমন পাবুজীর ফাড়, দেবনারায়ণজীর ফাড়, গোগাজীর ফাড় ইত্যাদি।

ভোপা:

রাজস্থানের একটি গায়ক সম্প্রদায় হল ভোপা । এরা মূলত লোকদেবতাদের ফাড়কে (পটচিত্র) সঙ্গে রাখেন এবং রাবণহতা ও তান্দুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সুর করে লোক দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত গান গেয়ে লোকদেবতা দের মাহাত্ম্য প্রচার করেন ।

দেবরে:

দেবরে হল রাজস্থানের লোক-দেবতাদের পূজার স্থল। রাজস্থানের বিশেষ করে পশ্চিম রাজস্থানের প্রতিটি গ্রামে এই পূজা স্থল চোখে পড়ে। সেখানে লোকদেবতারা ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট এবং প্রত্যেকের হাতেই ভালা নাম ক হাতিয়ার।

লোকদেবতা ও বীর পূজার ধারণা :

বীর পূজা হল সমাজে প্রচলিত সেই অনুভূতি যার ফলস্বরূপ সেই সমস্ত লোকদের প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় যারা তাদের সাহসিকতা ব্যতিক্রমীভাবে প্রদর্শ নকরে সাধারণ লোকের চোখে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। বীর পূজা হল বীর বা নায়ক হিসাবে বিবেচিত হওয়া ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধার ফল সাধারণত কোন ব্যক্তি তার কৃতকার্যে রজন্য যখন সাধারণের উপকার করেন বা তার নেতৃত্বে সমাজের উপকার সাধিত হয় তখন সাধারণ মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন ও তার কাজের প্রশংসা করেন। এইসব লোকেদের কাজ লৌকিক জনশ্রুতিতে পরিণত হয় ও তা ধারাবাহিকভাবে প্রচীন প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রচারিত হয়।। সময়ের সঙ্গে নানা উপকথা মূল জনশ্রুতিতে যুক্ত হয় ও সেই সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা বিয়ে বা নায়ক হিসাবে সমাজে পুজিত হতে থাকেন তারাই হলেন লোক দেবতা।

রাজস্থানের বিভিন্ন লোকদেবতা যারা প্রায় সকলেই যোদ্ধা সম্প্রদায়ের এবং মধ্যযুগে নানা যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে বহিরাগত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের রক্ষাকারী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে যুক্ত হয় নানা আখ্যান তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ হয়ে ওঠেন পশু সম্পদ রক্ষাকারী দেবতা, কেউবা সাপের থেকে রক্ষাকারী এইভাবে শ্রেষ্ঠ বীরের স্বীকৃতি প্রাপ্তরা লোক দেবতায় পরিণত হন।।

বেশিরভাগ লোক দেবতাদের বর্ণ নাএক বীরের রূপে করা হয়েছে। যেখানে তিনি একজন বলবান যোদ্ধা তার সঙ্গে অনন্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তারা একটি ঘোড়ার শীর্ষে উপবিষ্ট এবং হাতে ভালা নামক হাতিয়ার। পাবুজী, হাড়বুজী,তেজাজী সকলেই বীরোচিত গুণের অধিকারী তার সঙ্গে বাঁক সিদ্ধ। তাদের জীবনকালে তাদের আশীর্ব াদ্ষ্টানীয় শাসকরা শত্রুর ওপর বিজয় পেয়েছেন একইভাবে এই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের কার্য কলাপেলোককল্যাণ ও সাধিত হয়েছে।

উপসংহার:

রাজস্থানের ভূমিতে মহান বীরদের পাশাপাশি অনেক সাধু ও মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। রাজস্থানের এই পবিত্র ভূমিতে জন্ম নেওয়ার পর, লোক দেবতারা তাঁদের জীবদ্দশায় একজন সাধু-মহাপুরুষ হিসাবে শ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন এবং সর্ব জনীনভাবেলোকদেবতা হিসাবে গৃহীত হয়েছিলেন। আজও যে লোকদেবতারা লক্ষ মানুষের আস্থার কেন্দ্রবিন্দু, তাদের জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য মানুষ শ্রদ্ধা করে।

গ্রন্থ সূচি :

1. ভাটী,ড. বিক্রমসিং ‘রাজস্থান কে লোক দেবতা’, রাজস্থান শোধ সংস্থান, যোধপুর, 2017.
2. মানাবট, ড. মহেন্দ্র, ‘লোকদেবতা তেজাজী’, ভারতীয় লোক কলা মন্ডল, উদয়পুর, 1970
3. জুগনু, ড. শ্রীকৃষ্ণা, ‘রাজস্থান কী হীড় গায়িকী অর বগড়াবত দেবনারায়ন’ , আর্য াবর্তসংস্কৃতি সংস্থান , দিল্লী 2015
4. রাঠোর, ড. মহীপালসিং, ‘লোকদেবতাপাবুজী’, রাজস্থানগ্রন্থাগার, যোধপুর 2012
5. জৈন, ড. হুকুমসিং ও মালী, ড. নারায়ন লাল, ‘ রাজস্থান কা ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরম্পরা এবং বিরাসত’ , রাজস্থান হিন্দী গ্রন্থ একাডেমি, জয়পুর 2010
6. ‘রাজস্থান কা ইতিহাস এবং সংস্কৃতি’, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজস্থান ,আজমের, 2009
7. শর্ম ,াড. গোপিনাথ, ‘ রাজস্থান কা সাংস্কৃতিক ইতিহাস ‘, রাজস্থান হিন্দি গ্রন্থ একাডেমি, জয়পুর 1989
8. ব্যাস, ড. রাজেশ কুমার, ‘ সাংস্কৃতিক রাজস্থান’, রাজস্থান হিন্দি গ্রন্থ একাডেমি, জয়পুর, 2015
9. তানবর, মহেন্দ্র সিং, ‘ রাজস্থান কী সাংস্কৃতিক পরম্পরা’ রাজস্থানী গ্রন্থাগার, যোধপুর, 2006
10. নগর,ড. মহেন্দ্র সিং, ‘ রাজস্থান ইতিহাস তথা সংস্কৃতি কী ঝলকিয়া’ মহারাজা মানসিং পুস্তক প্রকাশ শোধ কেন্দ্র, যোধপুর, 2007

11. ভারদ্বাজ, ড. চন্দ্রশেখর, ‘রাজস্থান ইতিহাস, সমাজ, কলা ও সংস্কৃতি’ বিশ্বভারতী পাবলিকেশন, নতুন দিল্লি, 2017
12. গোস্বামী, ড. প্রেমচন্দ্র, ‘রাজস্থান: সংস্কৃতি, কলাএবংসাহিত্য’, রাজস্থানহিন্দিগ্রন্থএকাডেমি, জয়পুর, 2010